



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 711 - 717

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যে উর্বশী প্রসঙ্গ

ড. দিবাকর বর্মণ

সহকারী অধ্যাপক, মহাত্মা গান্ধী কলেজ, পুরুলিয়া

Email ID: dibakarbarman2012@gmail.com

 0009-0004-1870-1048

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Urvashi,
Modernity and
intellectualism,
Separation from
Rabindranath
Tagore, Myth
and legend, Love
and despair.

Abstract

Sudhindranath Dutta is one of the architects of modern Bengali poetry, free from Rabindranath Tagore's influence. In his poetry, 'Urvashi' is not an abstract, divine beauty, but rather a complex metaphor of modern love and despair born from the poet's own intellect. While Rabindranath's Urvashi is universal and benevolent, Sudhindranath's Urvashi is intensely personal, ephemeral, and steeped in the skeptical thought of a decadent age. From 'Tanvi' to 'Uttar Phalguni', Urvashi repeatedly returns in his poetic journey as a cursed muse, expressing the emptiness and dissatisfaction of modern life. Using myth and legend as a foundation, he brings Urvashi down to the dust of the mortal world, creating a unique 'new mythology'.

Discussion

উত্তর তিরিশের সূচনাকালে যে কয়েকজন কবি আধুনিক কবিতার সৃষ্টির নির্মাণ কল্পে তাঁদের ছাপ রেখে গেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। আপন কবি প্রতিভা কিংবা আপন স্বতন্ত্রতা এই দুইয়ের মেলবন্ধনে নিজেকে মেলে ধরেছেন বাংলা সাহিত্যের জগতে। অধ্যাপক অশোককুমার মিশ্র মহাশয়ের ভাষায়, -

“রাবীন্দ্রিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মানস প্রকৃতি এমন এক স্বতন্ত্র ধাতুর দ্বারা নির্মিত ছিল যে নিতান্ত তরুণ বয়সেই তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রকৃত কবি ব্যক্তিত্বকে অনুভব করতে পেরেছিলেন। ...রবীন্দ্রনাথ যখন বাংলা কাব্যের আকাশে মধ্যাহ্নে সূর্যের তেজে ভাস্বর তখন আবির্ভূত হয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। বাংলা কবিতা তখন শৈশব স্বতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য কেবল নিজের মনের কথা খেয়াল খুশিমতো বলে গেলেই আর চলল না। কবিকে হতে হল পরিশ্রমী।”

রবীন্দ্র প্রতিভা যখন মধ্য গগনে অর্থাৎ কালের হিসেবে যখন বিংশ শতকের প্রথম দুই দশক, তখন বাংলা সাহিত্যে অনেক ‘স্বভাব কবি’র আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁদের সহজাত কবিত্বশক্তি থাকলেও অনেকেই ছিলেন একান্তভাবে হৃদয় নির্ভর প্রেরণায় বিশ্বাসী। এঁনারা যেমন খুশি লিখেছেন, হৃদয়ের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির খুব একটা যোগ ছিল না। তাঁদের নিজস্ব আবেগকে সংযত করবার শক্তিও তুলনামূলকভাবে কম ছিল। ফলত অসংযম-জনিত কারণ তাঁদের পতনের জন্য দায়ী। রবীন্দ্র-সমকালে এই সব কবি গোষ্ঠী থেকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। নিজেকে এই রবীন্দ্রবলয় থেকে সরিয়ে রাখার

পিছনেও রয়েছে বিস্তার কারণ। একদিকে তাঁর পারিবারিক শিক্ষা অন্যদিকে শব্দভাণ্ডারে অবাধ বিচরণ। কবিতার ভাষাকেই মনন ঋদ্ধতায় শান দিয়েছেন, গড়ে তুলেছেন এক নির্ভেজাল অথচ গুরুগম্ভীর বলয়। যে বলয়কে পার করতে গেলে আমাদের প্রতিনিয়তই শরণাপন্ন হতে হয় অভিধানের। তার কবিতায় যে ধ্বনি বা সুর পাওয়া যায় তা আপাত দৃষ্টিতে দেখলে নদীর জলের মতো স্বচ্ছ মনে হয় না। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা কবিতার বেড়া ভেঙে নিয়ে আসেন নতুন শব্দ। যা তা শুধু পাঠকদের বিস্মিতই করে না রীতিমত তাদের হৃদয়ে এক কালবৈশাখীর ঝড় তোলে। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল রবীন্দ্র প্রভাব বা রবীন্দ্র আবহাওয়া থেকে মুক্তি পাবার জন্য তিনি কাব্যসাধনার প্রাকলপ্নে মার্গামের কাব্যদর্শকেই অনুসরণ করেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যদি এই নতুন পন্থা অবলম্বন না করতেন তাহলে পূর্ববর্তী স্বভাব কবিদের ন্যায় তিনিও কালের স্রোতে হারিয়ে যেতেন। কেননা এর আগে রবীন্দ্র রশ্মির তেজে অনেক নামি অনামী কবিদের বিলুপ্তি ঘটেছে। তাই তিনি চাননি কোনভাবেই যেন এই রবীন্দ্র প্রভাব তাকে গ্রাস করে। এখানে এসেই সংশয় উৎপন্ন হয় যে তাহলে কি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁকে কোনভাবেই স্পর্শ করেনি? এর উত্তর যথার্থই দিয়েছেন অধ্যাপক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় তার 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে। তিনি জানিয়েছেন, -

“তৃতীয় খাতায় উর্বশীকে কেন্দ্র করে একটি কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। কবিতাটির নাম ‘উর্বশী’ এবং আলোচ্য কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের ‘চিত্রা’ কাব্যের ‘উর্বশী’ কবিতার প্রভাব অনুপস্থিত নয়।”^২

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মহাশয় এর তথ্যকে সামনে রেখে আমরা বলতে পারি যে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত খুব সচেতনভাবেই রবীন্দ্র প্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্যই আধুনিক কবিতার ভাষা ও রীতির উপর জোর দিয়েছিলেন। এবার আমরা মূল বিষয়ে প্রবেশ করব।

আমরা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ঋক-বৈদিক যুগের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতাদের পাশাপাশি স্বর্গের অঙ্গরা উর্বশীর কথাও জানতে পারি। হিন্দু পুরাণ মতে অপরূপ লাবণ্যময়ী স্বর্গের অঙ্গরা ছিলেন উর্বশী। এই অঙ্গরা জন্ম সম্পর্কে নানা মতো প্রচলিত আছে। অনেকের মতে উর্বশী নারায়ণের উরু ভেদ করে বেরিয়ে আসেন তাই তার নাম হয় উর্বশী। আবার অনেকে বলেন সমুদ্র মন্থনের সময় সমুদ্র থেকে উত্থান ঘটে এই অঙ্গরার। এমনকি এই কথাটি ও প্রচলিত যে উর্বশী সাতজন মনুর সৃষ্টি। আমরা ঋকবেদে উর্বশী ও পুরুষবীর কাহিনী প্রচ্ছন্নভাবে পেয়ে থাকি। কিন্তু প্রকৃত সত্য প্রকাশের জন্য আমাদেরকে শতপথব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হতে হয়।^৩ এছাড়াও আরো অন্যান্য পুরাণে উর্বশীর কাহিনী প্রচলিত আছে। এখন আমরা এই সমস্ত মিথ তথা কিংবদন্তীকে দূরে সরিয়ে রেখে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যে উর্বশী প্রসঙ্গে প্রবেশ করব। পুরাণের উর্বশীকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে সহ আধুনিক যুগের এমন কোন কবি নেই যে উর্বশীকে নিয়ে কবিতা লেখেন নি। সুধীন্দ্রনাথ দত্তও তার ব্যতিক্রম নন।

‘তস্বী’ (১৯২৫) কাব্যগ্রন্থের ‘উর্বশী’ কবিতায় কবি প্রেমের ক্ষণস্থায়িত্বের কথা ব্যঞ্জনার সুরে তুলে ধরেছেন। কবি জানতেন স্বর্গের অঙ্গরা উর্বশীর প্রেম কখনোই চিরন্তন নয়। মানব জীবনের অস্থায়ী প্রেমকে সংক্ষেপে কবি ব্যঞ্জিত করেছেন। পুরাণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কবিদের থেকে অনেকাংশেই নতুনভাবে উর্বশীকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, -

“ ‘তস্বী’ কাব্যের অধিকাংশ রচনা ‘রবীন্দ্রনাথের রচনারই অপহৃত ভগ্নাংশ বলে’ মনে হলেও আলোচ্য কাব্যে সুধীন্দ্রনাথ উর্বশীকে নতুন পরিচয়ে উপস্থাপিত করলেন। রবীন্দ্রনাথ যেখানে উর্বশীর মাধ্যমে বিশ্বের বিমূর্ত সৌন্দর্যের রূপায়ণ ঘটাতো সচেষ্ট, সুধীন্দ্রনাথ সেখানে উর্বশীকে একান্ত ব্যক্তিগত ভাবনায় কেন্দ্রীকৃত করলেন।”^৪

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত উর্বশী চরিত্রটিকে ব্যক্তিগত ভাবনায় আলোকিত করে তুলুন না কেন ‘তস্বী’ কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্র-ভাবনার মায়ামোহে আচ্ছন্ন। কেননা কবি এই কাব্যের ভূমিকায় জানিয়েছেন, -

“কবিতাগুলি ওপরে স্বদেশী-বিদেশী অনেক কবিই ছায়াপাত করেছেন- সবসময়ে গ্রন্থাকারের সম্মতিক্রমে নয়। কেবল রবীন্দ্রনাথের ঋণ সর্বত্রই জ্ঞানকৃত।”^৬

আপাতদৃষ্টিতে কবি নিজেই যেন স্বীকারোক্তি দিয়েছেন যে তিনি রবীন্দ্রনাথের ঋণ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কোথাও যেন নিজের স্বতন্ত্রতার আতস কাঁচটি তুলে ধরতে ভুলে যান নি। কারণ পুরাণ-ভাবনায় কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যে উর্বশী চরিত্রের নির্মাণ করলেন তা অনেকাংশে রবীন্দ্রনাথের থেকে ভিন্ন। এবার দেখে নেওয়া যাক কোন অর্থে ভিন্ন। আমরা ‘তস্বী’ কাব্যগ্রন্থের ‘উর্বশী’ কবিতায় দেখি -

“একদা এক তৃষ্ণাবিধুর বিনিদ রাতে...
লুপ্তস্বর্গ উর্বশীটির উদয় হল অবনীতে,
দীর্ঘশ্বাসের অবসরে যখন তুমি
বলেছিলে আমায় চুমি,
“একলা শুধু তোমায়, সখা, বাসি ভালো;
জ্বালো শিরায় আগুন জ্বালো;”

(‘উর্বশী’, ‘তস্বী’)

‘তস্বী’ কাব্যগ্রন্থের ১১টি কবিতায় ‘উর্বশী’-সহ একাধিক পৌরাণিক কাহিনীর আখ্যান প্রসঙ্গ এসেছে। মিথ তথা পুরাণের উর্বশী চরিত্রটি ‘তস্বী’ কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে। উপরোক্ত অংশে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থাকলেও এই কবিতার পরবর্তী অংশে রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত হবার প্রয়াস দেখা গেছে।

“মধুতে তার নেই সে সুরা;
মর্মরপ্রায়, তোমার উরু আর না দহে;
চুষনে হিম ঝিমিয়ে রহে লীলায়িত অরাল ভুজের আলিঙ্গনে
বাঁধন ছেঁড়ার দুরাশা আজ জাগে মনের সংগোপনে।
রিজ্তা মোর, নগ্নতা মোর, দৈন্য দেখি,
উর্বশী আজ পালিয়েছে কি?
সকলই আজ লুপ্ত মোদের চিত্তদেশে
প্রেমের চিতা ভস্মশেষে।”

(‘উর্বশী’, ‘তস্বী’)

এখানে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত উর্বশীর পৌরাণিক আখ্যানের সূত্র-টুকু শুধুমাত্র গ্রহণ করেছেন। পৌরাণিক উর্বশীর ভাবনায় নবভাষ্য যোগ করে গড়ে তুলেছেন আপন প্রতিমা। ‘উর্বশী’ কবিতার উর্বশী কেন্দ্রিক প্রেমভাবনা পুরাণের উর্বশীর প্রেমভাবনাকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। এখানে উর্বশী আর রবীন্দ্র অনুসারী নয়। উর্বশীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক নব প্রেম নৈরাশ্য। যার হতাশা ও প্রেম সম্পর্কিত নেতিবাদী মনোভাব প্রকটিত হয়েছে। এই উর্বশী একান্তভাবেই সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ব্যক্তিগত মানস প্রতিমা, যাকে গড়ে তুলেছেন প্রেম আর অনুভূতির দ্যোতনাময় আঙ্গিকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর উর্বশীকে বিশ্বের বিমূর্ত সৌন্দর্যের অপরূপ কল্যাণময়ী রূপে নির্মাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সেখানে উর্বশীকে একান্তই ব্যক্তিগত ভাবনায় গড়ে তুলেছেন। এখানেই এই দুই কবির পৌরাণিক চরিত্র-বিন্যাসের রূপকল্পটি পৃথক হয়ে পড়ে। কবি পুরাণের অভিশপ্ত জীবন স্বরূপ উর্বশী ও পুরুরবার সৌন্দর্যমুগ্ধ মিথটিকে আখ্যানের সমান্তরাল রেখাচিত্রে ব্যবহার করেছেন। এখানে উর্বশী চরিত্রের মাধ্যমে আধুনিক প্রেমের অন্তঃসারশূন্যতা দেখানো হয়েছে। উর্বশীর ক্ষণস্থায়ী প্রেমের সঙ্গে অন্তর্ধানযোগ পুরাণ কাহিনীর আখ্যান অংশ নির্মাণ করেছে। উদ্ধৃতি অনুসারে উর্বশীর প্রথম আবির্ভাব ঘটে সমুদ্র মন্থনে। কিন্তু সেই মুহূর্তের সঙ্গে কবি উর্বশীর প্রেমিকা রূপের সমান্তরাল রচনার চিত্ররূপ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। সৃষ্টির নির্মাণকল্পে সমুদ্রের জল যেমন উর্বশীকে জড়িয়ে ছিল ঠিক তেমনভাবেই চীনাংশুক জড়িয়েছে উর্বশীর রক্তচরণ। কিন্তু এখানে উর্বশীর প্রেম ছিল ক্ষণিকের। তাই সুন্দরীর প্রেমও এখানে ক্ষণিক অর্থে স্থান পেয়েছে। আধুনিক জীবনের ক্ষয়িষ্ণু প্রেমের অবক্ষয়কে

কবি তুলেছেন এই উর্বশী চরিত্রের মাধ্যমে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় আধুনিক অবক্ষয়িত কালের রূপ চরিত্রটি পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর উর্বশী আলিঙ্গন বা আবেগের সঞ্চরে উন্নীত নয় কারণ তার বাঁধন ছেঁড়ার জন্য প্রতিনিয়তই তাকে প্ররোচিত করে, তার প্রেম দুরাশা মাত্র। তাই উর্বশী কবিতাটির পুরাণকল্প চিত্রিত হয়েছে অবক্ষয়িত যুগের রোমান্টিক প্রেমের সংকটময় পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে।

পরবর্তীতে উর্বশী প্রসঙ্গ পাওয়া যায় ‘অর্কেস্ট্রা’ কাব্যগ্রন্থের ‘সর্বনাশ’ কবিতায়। এখানে উর্বশী প্রসঙ্গ এলেও পৌরাণিক আখ্যানের উর্বশী ও পুরুষের কাহিনী অধরাই থেকে যায়। কবির ভাষায়, -

“সবই জানি, সবই আছে মনে।
 তবু বুদ্ধি হার মানে, নিরশ্রু ক্রন্দনে
 প্রাণের পরম শিরা ছিঁড়ে যায় মর্মমাঝে যেন।
 যদি তুমি পরাঙ্কে আসীনা,
 তবে কেন
 আজও বাজে সৃজনের বীণা;
 এখনও ভাঙে না তাল উর্বশীর হীরক নূপুরে?”

(‘সর্বনাশ’, ‘অর্কেস্ট্রা’)

স্বর্গের অঙ্গরা উর্বশীর আজ নৃত্যের তাল কাটে না। অর্থাৎ একদিন যে পুরুষকে দেখে উর্বশীর নৃত্যের তাল কেটেছিল- এখন তার নৃত্যে তাল কাটে না। সময়ের ছন্দে চলতে চলতে তার প্রাণের পরম শিরা ছিঁড়ে গেলেও মর্মমাঝে পুরুষের অস্তিত্ব অনুভব করে না। তাই আজ তার তাল ভঙ্গ হয় না। এই কবিতায় একসঙ্গে তিনটি পুরাণকে একত্রিত করেছেন কবি। একদিকে যেমন মহাদেবের অনুষ্ণ এনেছেন অন্যদিকে ইন্দ্রানীর প্রসঙ্গ আনতেও পিছু পা হননি। তার সঙ্গে সঙ্গে উর্বশীর প্রসঙ্গও এনেছেন। এই কবিতার লাইনে কোথাও যেন শতপথব্রাহ্মণের আখ্যানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এই ‘অর্কেস্ট্রা’ (১৯৩৫) কাব্যগ্রন্থের ‘অর্কেস্ট্রা’ কবিতায় কবি দু’বার উর্বশী প্রসঙ্গে এনেছেন। দ্বিতীয় কবিতায় কবি প্রশ্ন করেছেন উর্বশীর উদ্দেশ্যে -

“কল্পলোকের উর্বশী কি তুমি?” (‘অর্কেস্ট্রা’, ‘অর্কেস্ট্রা’)

অর্থাৎ কবির মনে গভীর জিজ্ঞাসা সৃষ্টি হয়েছে, যে স্বর্গের অঙ্গরা উর্বশীর রূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা এতদিন শুনে এসেছেন কল্পলোকে কী সেই উর্বশীর ছবি উদ্ভূত হয়েছে? অপরিমেয় রূপসৌন্দর্যের দেবী যিনি তিনিই কি উর্বশী? এই কবিতারই অপর একটি পংক্তিতে কবি জানিয়েছেন -

“অমৃতলোকের কৌতুকে কাঁপে ক্রন্দসী;
 পরিমণ্ডলে বাহিত অলকানন্দা;
 ঝিল্লীর ডাকে মরধামে নামে উর্বশী;
 তিমিরতোরণে ফুটেছে রজনীগন্ধা।”

(‘অর্কেস্ট্রা’, ‘অর্কেস্ট্রা’)

অর্থাৎ আজ উর্বশীর পদার্পণে কবির অমৃতলোকে রাত্রির অন্ধকারেও ফুটে উঠেছে রজনীগন্ধা। আমরা এখানে কোথাও সম্পূর্ণ আখ্যানের সন্ধান পায় না। শুধুমাত্র পৌরাণিক চরিত্রের নামটিকেই ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে আখ্যান পরিপূর্ণতা পায় নি।

‘ক্রন্দসী’ (১৩৪৪) কাব্যগ্রন্থের ‘অকৃতজ্ঞ’ কবিতায় আমরা উর্বশী প্রসঙ্গ পাই। এই কবিতায় আমরা উর্বশী ও পুরুষের কাহিনীর আভাস পাই। এই কবিতাই কবি দেখিয়েছেন স্বয়ংবরের মাধ্যমে নিজের কুমারীত্বকে নিবেদন করতে চেয়েছেন। এবং যখনই ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গল কামনায় ব্রতী হয়েছেন তখনই তার দুঃস্বপ্নের ঘোর ভেঙে গেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে যখন উর্বশী ও পুরুষকে স্বর্গরাজ্য থেকে মর্তে আসতে হয় তখন তাদের ওপর কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছিল। সেই শর্তগুলির প্রতিচ্ছবি যেন এই কবিতার চরণগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। কবির ভাষায় -

“স্বয়ংবরা শৈলসুতা এসেছে কৌমাৰ্য নিবেদিতে:
টুটেছে দুঃস্বপ্ন মোর ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গলাচরণে...
মোর প্রিয়সম্ভাষণে বিরহের আশঙ্কা সঞ্চগরি,
অন্তরের দ্বার জুড়ে হেসেছে অশ্লীল বিদূষক।
গোপন বৈভব আমি ব্যক্ত কভু করিনি প্রিয়ারে;”
(‘অকৃতজ্ঞ’, ‘ক্রন্দসী’)

এখানে কবি যেমন বলছেন ‘প্রিয়সম্ভাষণ’ করলেই তিনি হয়তো তার প্রেমিকাকে চিরতরে হারিয়ে ফেলবেন। ঠিক তেমনভাবেই উর্বশী যদি কোন কারণে পুরুষকে বিব্রত দেখে ফেলেন তাহলে তখনই তাদের বিচ্ছেদ ঘটবে। এমনই একটি আশঙ্কা কবিতার এই স্তবকে ফুটে উঠেছে। উর্বশী কোনদিনই পুরুষকে হারাতে চাইনি, তাই তো গান্ধৰ্বদের ছলনার কাছে তাদের পরাজয় ঘটেছে। এখানে হয়তো কবি সম্পূর্ণ কাহিনীটির অবতারণা করেননি কিন্তু ব্যঞ্জনার ছলে কবি পৌরাণিক আখ্যানটির আভাস দিয়ে গেছেন। কবির ভাষায়-

“কেবলই চেয়েছি আমি, ক্ষতি কভু ছোঁয়নি আমারে;
কোনওদিন বজ্রাঘাতে সর্বস্বান্ত করেনি উর্বশী;”
(‘অকৃতজ্ঞ’, ‘ক্রন্দসী’)

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘উত্তর ফাল্গুনী’ কাব্যের ‘ব্যবধান’ (১৯৩৩) কবিতায় আখ্যানের সন্ধান পাই। এখানে কবি আধুনিকতার মোড়কে পুরাণের উর্বশীর আখ্যানকে কাব্যরূপ দিয়েছেন। ‘ব্যবধান’ নামকরণের মধ্য দিয়ে কবি উর্বশীর আখ্যানকে নতুন রূপে তুলে ধরেছেন। এতদিন পর্যন্ত যে উর্বশী অধরা ছিল তাকে সেই উর্বশীকে মর্তলোকের বাসিন্দা করে তুললেন কবি। যে উর্বশী একদিন শাপভ্রষ্ট হয়ে এই পৃথিবীর বৃকে তার সংসার গড়েছিল তারই পরিস্ফুট রূপ ভেসে উঠেছে এই কবিতায়। কেননা মর্তলোকে বসবাস করার সময় পুরুষ ও উর্বশীর মধ্যে তেমনভাবে কোন গভীর সম্পর্কের গড়ে ওঠেনি। এই আখ্যান অংশকে কবি ‘ব্যবধান’ কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছেন। কবির ভাষায় -

“...কোনও এক সন্ধ্যায় এমন-
যুগান্তে, জন্মান্তে যেন শাপভ্রষ্ট কে এক উর্বশী
অন্তদীপ্ত উন্মাসম করপুটে পড়েছিল খসি
অধরার মুক বার্তা মর্ত্যরজে করিতে সঞ্চগর।
সে-দিনে মুহূর্তকাল অবচ্ছিন্ন শরীর আমার
অম্লান, অনন্ত বীর্যে উঠেছিল উচ্চকিত হয়ে;
অনাদ্য ওৎকারনাদে জেগেছিল প্রতন হৃদয়ে চিরঞ্জীব পুরুষবা।।”
(‘ব্যবধান’, ‘উত্তর ফাল্গুনী’)

কোন এক সন্ধ্যায় শাপভ্রষ্ট উর্বশী উষ্কার মতো ঝরে পড়েছিল এই পৃথিবীতে। এই বিশ্ব প্রকৃতির যা কিছু অধরা ছিল সেই অধরার মাঝে প্রাণসঞ্চগর করার জন্যই তো উর্বশীর মর্তে আর্বিভাব। ‘ব্যবধান’ কবিতায় কবি তার বিচ্ছেদ ঘটা প্রেমিকার সঙ্গে উর্বশীর তুলনা করেছেন এবং নিজেকে মনে করেছেন পুরুষবা। এই তুলনার মাধ্যমে নিজের হৃদয়ে উর্বশীরূপী প্রেমিকাকে চিরন্তন জায়গা দিয়েছেন। পরের স্তবকেই কবি দেখিয়েছেন পুরুষবার প্রতি গান্ধৰ্বের ছলনাতে উর্বশী মর্ত্য রাজ্য ছেড়ে বিদায় নেন। এর ফল স্বরূপ পুরুষবা বারবার উর্বশীর সন্ধান করতে থাকেন। কবির ভাষায় -

“সে-দিব্য মিলনে তুমি অধিকার দাওনি আমারে।
তোমার বিশুদ্ধ বাক্য তাই মোর রুদ্ধ চিত্তদ্বারে
বৃথা করাঘাত হানি নিরন্তর ফিরে ফিরে যায়।
তোমার সান্নিধ্যে তাই ব’সে থাকি আমি মৌনপ্রায়।”
(‘ব্যবধান’, ‘উত্তর ফাল্গুনী’)

শতপথব্রাহ্মণে ও পুরাণে যে আখ্যানটি পাওয়া যায় তার সঙ্গে উক্ত স্তবকের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কেননা রাজা পুরুরবাকে নগ্নাবস্থায় দেখে উর্বশী শাপমুক্ত হলেও পুরুরবা উর্বশীকে পুনরায় পাবার জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করেছিলেন। অবশেষে কুরুক্ষেত্রের কাছে চারজন হংসধারী অঙ্গরার মাঝে উর্বশীর দেখা পান। পুরুরবার অনুরোধে উর্বশী বছরের শেষ রাত্রে মিলনের প্রতিশ্রুতি দেন।^৯ এখানে উর্বশী পুরুরবার কাহিনীটির ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন কবি। এই কবিতাটিতে আমরা পৌরাণিক আখ্যানের কাহিনীটিকে অনুধাবন করতে পারি এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এছাড়াও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘উত্তর ফাল্গুনী’ কাব্যের ‘প্রতিদান’ ও ‘প্রতিপাদ’ কবিতাতেও উর্বশী প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল এই উর্বশী কোন কোন অর্থে সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের থেকে আলাদা। এর উত্তরে আমরা বলতে পারি, কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের উর্বশী সম্পূর্ণরূপে না হলেও ক্ষণিকের জন্যও তিনি অধরা এবং অমৃতের মন্থন সাগরে এই উর্বশীর আবির্ভাব। কিন্তু কবির গভীর রোমান্টিক মানস মন্থন থেকেই এই অপকল্প উর্বশীর উত্থান ঘটেছে একথা সর্বজন স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথের উর্বশীর আবির্ভাব ঘটেছিল পূর্ণ সৌন্দর্য্য দ্যুতিসহ। যার এক হাতে ছিল সুধা ও অপর হাতে বিষ। আর সুধীন্দ্রনাথ এর উর্বশী মিলনের প্রতিশ্রুতি ও প্রণয়ের অসমাপ্তি এবং মরণের নিঃসঙ্গ ব্যর্থতা নিয়ে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উর্বশীও বর্তমানকালের প্রেক্ষিতে রোমান্টিকতা ও আশা ব্যাকুলতায় দূর মননের যাত্রী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত উভয়ের সৃষ্টি উর্বশী চরিত্রটি রোমান্টিক কল্পনার দ্বারা আবৃত। এখানে কোন দ্বন্দ্ব নেই। পার্থক্য শুধুমাত্র এই যে রবীন্দ্রনাথ যে কল্পনার সাগরে ঝাঁপ দিয়ে সৌন্দর্য্য ও পিপাসার জাগরণ ঘটান সেখানেই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মায়া ও শূন্যতার মাঝে অনন্তের নৈরাশ্যে প্রবেশ করেন। এই প্রসঙ্গে মাহবুব সাদিক তাঁর ‘কবিতায় মিথ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ’ গ্রন্থে জানিয়েছেন-

“রবীন্দ্রনাথের উর্বশীও বর্তমান কালপ্রেক্ষিতে রোমান্টিক কল্পনা, দূর-স্মৃতিমাত্র- কিন্তু কবিপ্রাণে তার জন্যে জেগে থাকে রোমান্টিক আশা-ব্যাকুলতা। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের উর্বশীও কেবলি রোমান্টিক- কল্পনা। পার্থক্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ যেখানে সৌন্দর্য্য ও আশার জাগরণ ঘটান, - সুধীন্দ্রনাথের উর্বশী সেখানে মায়া ও শূন্যতামাত্র এবং কবি তার সন্ধানে ‘অনন্ত নৈরাশ্যরন্ধ্রে’ প্রবেশ করেন।”^{১০}

এবার আসা যাক তুলনামূলক বিশ্লেষণ এর পাঠে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আলোকে সুধীন্দ্রনাথের উর্বশীর নিবিড় পাঠে দেখা যায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন মূলত মননশীলতার কবি। তাঁর উর্বশী কেবল রক্ত-মাংসের নারী নয়, বরং তা এক শাস্ত্রত অতৃপ্তি ও আধুনিক নৈরাশ্যের প্রতীক। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর যে যোগসূত্র তা তুলে ধরা হল। যেমন- পাশ্চাত্য সাহিত্যের মার্লানে ও এলিয়টের প্রভাব। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যচেতনার মূলে ছিল ফরাসি প্রতীকবাদী কবি স্তেফান মার্লানে (Stéphane Mallarmé)-র প্রভাব। মার্লানের কবিতায় যেমন শব্দ চয়ন ছিল অত্যন্ত সতর্ক এবং গুঢ়, সুধীন্দ্রনাথও তেমনি উর্বশীকে এক রহস্যময় ও দূরবর্তী প্রতীকে রূপান্তর করেছেন। মার্লানের কাছে সৌন্দর্য্য ছিল এক অধরা আইডিয়া (Idea); সুধীন্দ্রনাথের কাছেও উর্বশী ‘কল্পলোকের’ সেই অধরা সত্তা।

দ্বিতীয়ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় টি. এস. এলিয়ট (T. S. Eliot) ও আধুনিক নৈরাশ্য প্রাধান্য পেয়েছে। এলিয়টের ‘The Waste Land’-এ যেমন আধুনিক জগতের বন্ধাত্ম ধরা পড়েছে, সুধীন্দ্রনাথের উর্বশী-কল্পেও সেই অবক্ষয়িত সময়ের ছাপ স্পষ্ট। এলিয়টের কবিতায় যেমন মিথ বা পুরাণ বর্তমানের রিজুতাকে তুলে ধরে, সুধীন্দ্রনাথও তেমনি উর্বশী-পুরুরবার মিথ ব্যবহার করে আধুনিক প্রেমের অন্তঃসারশূন্যতা ও ‘ব্যবধান’ ফুটিয়ে তুলেছেন।

এবার আসাযাক প্রাচ্য সাহিত্যের কথায়, যেখানে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব বর্তমান। সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকবি কালিদাসের ‘বিক্রমোর্বশীম’ নাটকে উর্বশী ও পুরুরবার বিরহ ও মিলন এক ধ্রুপদী মহিমা লাভ করেছে। কালিদাসের উর্বশী মানবিক আবেগে কম্পিত। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কালিদাসের সেই ধ্রুপদী কাঠামোটি গ্রহণ করলেও সেখানে রোমান্টিক পূর্ণতার বদলে বিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক সংশয়কে স্থাপন করেছেন।

আসীমের চিরবিস্ময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সৌন্দর্য্যের উপাসনাকে অস্বীকার না করেও তাকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধুনিকতার কঠিন মৃত্তিকায় রোপণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের উর্বশী হল বিমূর্ত সৌন্দর্য্যের প্রতীক, যেখানে কোনো ব্যক্তিগত অধিকার নেই। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের উর্বশী একান্তই ব্যক্তিগত মানস-প্রতিমা। রবীন্দ্রনাথের উর্বশী যেখানে ‘নিষ্কলঙ্ক শশী’,

সুধীন্দ্রনাথের কাছে সে এক মায়াবী কুহক, যা কেবল ‘অনন্ত নৈরাশ্যরঞ্জে’ নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেখানে সৌন্দর্যের আলোকবর্তিকা হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ সেখানে সেই আলোকের আড়ালে থাকা অন্ধকারকে চিনেছেন। তাই তাঁর উর্বশী কেবল এক পৌরাণিক অঙ্গরা নয়, বরং তা মানুষের শাশ্বত অতৃপ্তি ও ‘অনন্ত নৈরাশ্যরঞ্জে’ প্রবেশের এক দার্শনিক প্রেক্ষাপট।

পুরাণে উল্লিখিত উর্বশী ও পুরুরবার কাহিনী কেবল একটি প্রেমগাথা নয়, এর গভীরে লুক্কায়িত আছে মানুষের সীমাবদ্ধতা ও প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের দ্বন্দ্ব। মর্ত্য ও স্বর্গের চিরন্তন ব্যবধান এর দ্বন্দ্ব। পুরাণে উর্বশী যখন মর্ত্যে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে শর্ত ছিল। পুরুরবাকে তিনি কখনোই নগ্ন অবস্থায় দেখবেন না। এই শর্তটি আসলে একটি দার্শনিক সত্যের ইঙ্গিত দেয়। উর্বশী হলেন অতিপ্রাকৃত বা ‘আইডিয়াল’ (IDEAL) সৌন্দর্য, আর পুরুরবা হলেন মর্ত্যের সীমাবদ্ধ মানুষ। মানুষের নগ্নতা বা দুর্বলতা যখন সৌন্দর্যের (উর্বশীর) সামনে উন্মোচিত হয়, তখনই সেই সৌন্দর্যের তিরোধান ঘটে। সুধীন্দ্রনাথ এই ‘ব্যবধান’ কবিতায় দেখিয়েছেন যে, মানুষের স্থূল আকাঙ্ক্ষা যখন সূক্ষ্ম সৌন্দর্যকে স্পর্শ করতে চায়, তখনই বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু মন্তন ও বিষাদ এর প্রশ্নে বিস্তর ফারাক দেখা যায়। সমুদ্র মন্তন থেকে যেমন গরল ও অমৃত দুই-ই উঠেছিল, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাছে উর্বশী সেই মন্তনজাত এক অনুভূতি। তবে তাঁর উর্বশী সুধার চেয়ে বিষাদকেই বেশি বহন করে। পাশ্চাত্য দার্শনিক হেগেল বা নিৎসের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে বলা যায়, সুধীন্দ্রনাথের উর্বশী হল সেই ‘ডায়োনিসিয়ান’ সত্তা, যা শৃঙ্খলা ভেঙে মানুষকে এক অস্থির ও নিরুদ্দেশ যাত্রায় পাঠিয়ে দেয়।

পরিশেষে বলা যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যাকাশে উর্বশী কেবল এক পৌরাণিক অঙ্গরা বা চিরায়ত সৌন্দর্যের প্রতীক মাত্র নয়; বরং তা কবির নিজস্ব মননজাত আধুনিকতা ও প্রেম-নৈরাশ্যের এক জটিল রূপক। রবীন্দ্র-বলয় থেকে সচেতনভাবে নিজেকে বিযুক্ত করার যে প্রয়াস সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে লক্ষণীয়, উর্বশী চরিত্রের বিনির্মাণে তা অত্যন্ত স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের কাছে উর্বশী ছিল ‘নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধু’- এক বিশ্বজনীন বিমূর্ত সৌন্দর্য। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ সেই সৌন্দর্যকে মর্ত্যের ধুলোয় নামিয়ে এনেছেন, তাকে লিপ্ত করেছেন ব্যক্তিক বিরহ, অতৃপ্তি এবং অবক্ষয়িত যুগের সংশয়বাদী চিন্তায়।

‘তব্বী’ থেকে ‘উত্তর ফাল্গুনী’ পর্যন্ত তাঁর কাব্য পরিক্রমায় উর্বশী বারবার ফিরে এসেছে শাপভ্রষ্ট এক মানসী হিসেবে, যার ক্ষণস্থায়ী প্রেম আধুনিক জীবনের অন্তঃসার শূন্যতাকেই প্রকাশ করে। একদিকে ধ্রুপদী আভিজাত্য এবং অন্যদিকে আধুনিক মানুষের গহন বিষাদ। এই দুইয়ের সন্ধিক্ষেত্রে দাঁড়িয়েই সুধীন্দ্রনাথের উর্বশী স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল। মিথকে কীভাবে সমকালের দর্পণে স্থাপন করে এক ‘নব-পুরাণ’ নির্মাণ করা যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের উর্বশী প্রসঙ্গ তারই সার্থক স্বাক্ষর বহন করে।

Reference:

১. মিশ্র, ড. অশোককুমার, আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা (১৯০১-২০০৮), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭, কলকাতা বইমেলা, ২০০২, পৃ. ১৬০
২. মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জীবন ও সাহিত্য, (সংকলন ও সম্পাদনা), প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৮৭, কলকাতা- ০৭, পৃ. ৬৪৬-৬৪৭
৩. সরকার, সুধীরচন্দ্র, পৌরাণিক অভিধান, (সংকলিত), এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৬৫ আষাঢ়, পৃ. ৯৪
৪. মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার, আধুনিক বাংলা কবিতায় পুরাপ্রতিমা ও লোকপ্রতিমা, প্রতিভাস, বইমেলা ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ১৭৩
৫. উৎস ২, পৃ. ৬৪৬-৬৪৭
৬. উৎস ৩, পৃ. ৬৫-৬৬
৭. সাদিক মাহবুব, কবিতায় মিথ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ, অ্যাডার্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, নভেম্বর ২০১১, পৃ. ৪৫